Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-II, January 2025, Page No.13-20
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের মানবিক আবেদন

সোমেন পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটী, আসাম, ভারত

ড. বিনীতা রাণী দাস
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যাল, গুয়াহাটী, আসাম, ভারত

Abstract

Some aspects of life's energy that never quite disappear from people's consciousness and subconsciousness can be found in Alaol's poetry. These components are romance, adventure, and sex. The original poetry 'Padumavat' by Jayasi, translated by Alaol, contains tales of love's triumphs and failures, but the Sufi idea has gained prominence under the guise of metaphor. However, Alaol's "Padmavati" is not an allegorical Sufi poem; rather, the poet uses mediaeval romance to add as many human emotions as possible to the love and battle poetry. People of all ages have an enduring longing for romance, adventure, and sex; Alaol has revealed these to the light of life by breaking the wall of the mediaeval religious prison. We are primarily introduced to the love of religion, love of devotion, and love of the divine through mediaeval literature. Alaol demonstrated how love may be the basis of a natural yet dreamy romance. Ratnasena's tough voyage was conquered by the overwhelming allure of Padmavati's beauty, the emperor of Delhi, Alauddin invaded Chittor and fought for this beauty, and Devpala's duplicity for this beauty— everything revolved around the woman's beauty. Alaol opened the theocratic humanist free love for the narrow-minded Bengalis who were imprisoned for their conjugal love.

Keywords: Alaol, Padmavati, Love, Romance, Humanity.

শেখ আলাওলের জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া কঠিন হলেও, ধারণা করা হয় যে তাঁর জন্ম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদে হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন আরাকানের (বর্তমান মায়ানমারের রাখাইন) মুসলিম সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। শৈশবে আলাওল তাঁর পিতার সঙ্গে আরাকানে যান এবং সেখানেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। আরাকান রাজ্যের মুসলিম শাসনের অধীনে আলাওল বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি বাংলা, ফার্সি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন। আলাওলের এই ভাষাজ্ঞান তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্মীয় ও রোমান্টিক কাব্যধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে

সাহিত্যিকরা প্রধানত দেববাদী ধর্মীয় কাব্য এবং রোমান্টিক প্রেমকাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করতেন। ধীরে ধীরে বাংলা কাব্যিক ধারায় ইসলামি মূল্যবোধ, আরবি-ফার্সি সাহিত্য এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। শেখ আলাওলের সাহিত্যিক জীবন এই ধরণের সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন কাব্যধারার মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করে। আলাওল যেমন ফার্সি ও আরবি সাহিত্যে প্রভাবিত ছিলেন, তেমনই তিনি স্থানীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। হিন্দু পুরাণ, ধর্ম এবং কাব্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। পদ্মাবতী কাব্যের মূলে যে কাহিনি রয়েছে তা হিন্দু পুরাণের উপর ভিত্তি করে রচিত। রত্নসেন, পদ্মাবতী, এবং আলাউদ্দিন খিলজি-এই সমস্ত চরিত্রগুলো মধ্যযুগীয় ভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, "কবি পিঙ্গলাচার্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট-মহাগণের তত্ত্ববিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট-নায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোাচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশান্তিবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ধরিয়াছেন।"

সর্বোপরি ধর্ম সংকীর্ণতা-মুক্ত মানবিকতার এমন একটা ভাবলোক আলাওল সৃষ্টি করেছেন, যা মধ্যযুগে দুর্লভ। তাই কবিকঙ্কনের মতো মানবচরিত্র রসিক না হলেও, কিংবা পদাবলির কবিদের মতো সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী না হলেও আলাওলই একমাত্র কবি যিনি সেই মধ্যযুগের পর থেকে তাঁর উদার মানবিকতায় কতকাংশে স্মরণ করিয়ে দেন এই যুগের রবীন্দ্রনাথকে।

সম্রাট শেরশাহের আমলে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে জায়সি সুফি-ভাবনার আধ্যাত্মিক প্রেমরস অবলম্বন করে কিছুটা রূপকথার জাদু, কিছুটা মায়া দিয়ে যে অসামান্য অধ্যাত্মরসের প্রেমের কাব্য রচনা করেছিলেন, শতবর্ষ পরে আরাকানের রাজসভায় বসে সেই কাব্য অনুবাদ করতে গিয়ে স্বদেশ-স্বকালের দাবি পূরণ করার মানসে বাঙালি কবির কাব্য হিন্দি কবির কাব্য থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। শতবর্ষের ব্যবধানেও উভয় কাব্যের সমাজব্যবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি।

কাব্যে বর্ণিত হয়েছে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবি। সমাজের শীর্ষে রাজা। তাঁর চারপাশে অভিজাত শ্রেণি, তারপর রয়েছে সমাজের নানা স্তরের মানুষ। ভূমিভিত্তিক সামন্ত প্রভুরা ছিলেন সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি। এঁরাই ছিলেন অমাত্য-মহাজন। প্রচুর ভোগবিলাসে মত্ত ও অবসর-বিনোদনে পুষ্ট এই শ্রেণি যুদ্ধ ও কাব্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক রস-সমৃদ্ধ ও দার্শনিক তত্ত্বাশ্রয়ী কাহিনির চেয়ে মানবরস সমৃদ্ধ প্রেম ও যুদ্ধ কাহিনির উত্তেজনাপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলির কাব্য পছন্দ করতেন বেশি। রাজসভার এই দাবি পূরণ করার কারণেই জায়সির রূপক কাব্য আলাওলের হাতে রোমান্সে পরিণত হয়েছে। তাই আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য মানবরস সমৃদ্ধ কাব্য হিসেবে বিবেচ্য, কাহিনি বর্ণনার নিপুণতা আর চরিত্র-চিত্রণের অপরূপ দক্ষতায় 'পদ্মাবতী' কাব্যের মানবিক মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ও অমাত্যবর্গের রস ও রুচিবোধই এর মূল কারণ।

মধ্যযুগীয় বাংলা ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময়। ইসলামি শাসন এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভিন্ন আদর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সামাজিক নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মাঝেও নৈতিকতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের জীবনের অন্যতম অংশ ছিল। আলাওল তাঁর কাব্যে এই মূল্যবোধ এবং আদর্শগুলোকে প্রতিফলিত করেছেন, যা মধ্যযুগীয় সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে প্রাকৃতিক শক্তি প্রবৃত্তি সঞ্চালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে 'কামাগুন' ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে। নারীর মধ্যে এই কামাগুন যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আছে বলে ভ্রমররূপী পুরুষ যুগ যুগ ধরে তীব্র বাসনাসহ তার দিকে ধেয়ে চলেছে। এই ধাবমানতার শেষ নেই কোথাও। পদ্মাবতীর রূপের মোহে ছুটে চলা এই পুরুষের মধ্যে রত্নসেনও আছেন, সুলতান আলাউদ্দিনও আছেন, দেবপালও আছেন। রোমান্স ও রূপকথার যূথবদ্ধ আবরণ ভেদ করে কবি একটা গূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছিলেন —— প্রবৃত্তি যতক্ষণ আছে, মানুষ ততক্ষণই মানুষ। মধ্যযুগের ধর্মপ্লাবিত বাতাবরণে ঈশ্বরের চেয়েই অধিক শক্তিশালী রূপে মানুষকে স্থাপন করতে গিয়ে আলাওল প্রবৃত্তি ও ভোগের দুর্বার চিত্র অংকন করেছেন। আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনিকে আলাওল লৌকিক ও মানবিক প্রেমকাহিনিতে পরিণত করেছেন। এই প্রেম পরকীয়া প্রেম। অন্তঃপুরে রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরনারীর প্রতি পুরুষের অকর্ষণ, তাকে লাভ করার সীমাহীন চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ সংগঠিত হয়েছে পদ্মাবতী কাব্যে। স্ত্রী নাগমতি গৃহে থাকা সত্ত্বেও রাজকুমারী পদ্মাবতীকে লাভের জন্য রত্ন সেনের হৃদয় ছাটপট করেছে। মধ্যযুগে বহুবিবাহ একটি সাধারণ ও অতি প্রচলিত ব্যবস্থা। কিন্তু গায়ের জোরে কিংবা শক্তির দম্ভে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বাসনা রত্নসেনের নেই।

মধ্যযুগের সামন্ত দরবারে পরকীয়ার এই ব্যভিচারই সত্যিকারের প্রেম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা প্রমাণিত যে প্রেমিক-সামন্ত সব-সময়েই বিপুল কৃচ্ছসাধনা, সীমাহীন সুকঠোর তপস্যা, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সফল অভিযানের মাধ্যমেই বাঞ্ছিতা নারীকে লাভ করেছেন। দরবারি প্রেমের এই বৈশিষ্ট্যও কম মূল্যবান নয়, শুধু একটা মাত্র নারীর প্রেমলাভের জন্য কি অপূর্ব আত্মত্যাগ। বিনয়ী, ভদ্র, কষ্টসহিষ্ণু, বীরযোদ্ধা সামন্ত প্রেমিক অশ্রুজলের বন্যা বইয়ে দিয়ে প্রিয়তমাকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছন। সামাজিক-ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অমান্য করে রোমান্সের নায়ক-নায়িকা উভয়েই উভয়ের মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। একদিকে বিপুল কৃচ্ছ্বসাধনা, অন্যদিকে কামনা-বাসনা চরিতার্থের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রেম সফল হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে যুগে প্রনয়ের ব্যাপারটাকেই সমাজে কটু চোখে দেখা হত, সেই যুগে সামাজিক নিষেধকে উপক্ষা করে পদ্মাবতী কাব্যে প্রেম কাহিনীর সংযোজনে রোমান্স ভাবনার সঞ্চার ঘটেছে।

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের মরমিয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। আলাওল ধর্মমতে ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ধর্মবিশ্বাস থেকে তিনি অর্জন করেছিলেন উদার অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাচেতনা। কাব্য এই উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছেন কবি। ফলে মুহম্মদ জায়াসির রূপক আধ্যাত্মিক তত্ত্বরসের কাব্য আলাওলের হাতে জীবনরসে পরিণত হয়েছে, এবং কাব্যে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধি-বিধানের পরিবর্তে মানবিক আবেদন সুস্পষ্ট হয়েছে। বিবাহপূর্ব মিলন এবং পরকীয়া প্রেম সমাজস্বীকৃত নয়। আলাওল পরকীয়া প্রেম রূপায়ণ করতে গিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার একটি সুন্দর মীমাংসাও করেছিলেন। রূপক অলংকারের মধ্যদিয়ে সেই প্রেমক প্রকাশ করা। তাছাড়া এই অবৈধ ও ব্যভিচারী প্রেম শালীনতার রূপ পেত না। তাই অলাওল পরকীয়া প্রেমকে আড়াল করার জন্য

অতীন্দ্রিয় পোশাক পরিয়ে শেষ পর্যন্ত মরমীয়া সাধনতত্ত্বের জয়গান গেয়েছেন। সাংস্কৃতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ আলাওল অতি সহজেই সুফিবাদী চেতনার সঙ্গে রোমান্স ভাবধারার সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর এই অমর কাব্যে।

সুফিবাদী প্রেম আর বৈষ্ণবীয় ভাবদর্শের সমন্বয়ে নির্মিত আলাওলের এই প্রেমকাহিনি জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আধ্যাত্মিকতা লাভ করলেও মর্ত্যলোকের নরনারীর হৃদয়গত কামনা-বাসনা-লালসার চিত্র ফুটে উঠেছে বেশি। রত্নসেনের হৃদয়ে পরকীয়া প্রেমের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির চিত্র প্রায় সবটুকুই মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। কিন্তু রত্নসেনের তুলনায় আলাউদ্দিন ও দেবপালের ইন্দ্রিয়-ভোগলালসা এতই প্রবল যে তা সীমাহীন দিগন্তে ধাবিত হয়েছে। পদ্মাবতীর প্রতি আলাউদ্দিন ও দেবপালের যে পরকীয়া প্রেম ছিল, তাতে কৃচ্ছসাধনার শক্তি ছিল না, ছিল ক্ষমতার দম্ভ আর কামনা-বাসনার উগ্র লালসা। রত্নসেনের পরকীয়া প্রেমতত্ত্বে উভয়ই ছিল। সেকারণে প্রেমসাধনায় তিনি জয়ী হয়েছেন। আলাউদ্দিন-দেবপাল ব্যর্থ হয়েছেন।

আলাওলের রচনা বিশেষভাবে রূপক ও উপমার মাধ্যমে সমৃদ্ধ। তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন চাঁদ, সূর্য, ফুল, নদী ইত্যাদি ব্যবহার করে মানবজীবনের নানা দিককে রূপায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি চাঁদ ও পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা তাঁর কাব্যিক শৈলীর গভীরতা ও নান্দনিকতাকে প্রকাশ করে। তাঁর প্রেমকাহিনিগুলোতে আধ্যাত্মিক প্রেমের ছোঁয়া পাওয়া যায়। রোমান্টিক প্রেমের মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপস্থাপন করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে নতুন একটি দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। তাঁর প্রেমের কাব্যগাথায় কেবল শারীরিক আকর্ষণ নয়, বরং আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাব্যে প্রেমের আধ্যাত্মিক দিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব আলাওল বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। এই আধ্যাত্মিক প্রেম মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজে বিশেষ মূল্যবোধ স্থাপন করে, যেখানে প্রেম কেবল পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকতার প্রতীক। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই প্রেমের ধারণা এবং নৈতিকতা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আলাওলের কাব্যে প্রেমের গভীরতা এবং আধ্যাত্মিকতা সমাজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করে।

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে ইসলাম ধর্মের নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। সতীত্ব, নৈতিকতা, এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে আলাওল ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কাব্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে, যা কেবল প্রেমের কাহিনিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে।

পদ্মাবতী কাব্য মধ্যযুগীয় সামাজিক সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। কাব্যে রত্নসেনের মাধ্যমে আদর্শ রাজার প্রতিচ্ছবি এবং পদ্মাবতীর মাধ্যমে আদর্শ নারীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আলাউদ্দিন খিলজি চরিত্রটি লোভ, ক্ষমতার মোহ, এবং দুর্নীতির প্রতীক। তার মাধ্যমে আলাওল ক্ষমতার প্রতি মানুষের লোভ এবং এর ফলে যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে, তা দেখিয়েছেন।

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের নৈতিক চেতনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নৈতিকতা বনাম ক্ষমতার লড়াই। রত্নসেন এবং পদ্মাবতীর প্রেমের কাহিনি নৈতিকতার প্রতীক, যেখানে ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে

আলাউদ্দিন খিলজি বিরোধিতা করেন। এই লড়াইয়ে আলাওল দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতার মোহ এবং লোভ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, নৈতিকতা সবসময় জয়লাভ করে।

পদ্মাবতী কাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ থিম হল সতীত্ব ও আত্মমর্যাদা। পদ্মাবতী শুধুমাত্র একজন সুন্দরী রানি নন, তিনি একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী। তিনি তাঁর সতীত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন, এবং কাহিনির শেষে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের মর্যাদা রক্ষা করেন। এটি কেবল একটি নারীর সতীত্ব রক্ষার কাহিনি নয়, বরং সমাজের প্রতি নারীর আত্মমর্যাদা এবং সম্মানের দাবীর একটি প্রতীকী উপস্থাপনা।

আলাওলের লক্ষ্য ছিল জীবনরস রূপায়ণের দিকে। তাই আলাওলের কাব্যের শেষভাগে দেখা যায়— চিতোরের দূর্গ প্রাকারে নৃত্যশালা নির্মিত হয়েছে। অদূরে অত্যুচ্চ বেদিতে আলাউদ্দিনের কামান সজ্জিত। মুহূর্ত পূর্বেও যেখানে গোলাবর্ষণ ঘটেছে, নর্তকীর নৃত্যতালে উচ্চকণ্ঠ সংগীতে সে স্থান মুখর হয়ে উঠল। আরাবল্লীর শিখরে শিখরে তা প্রতিধ্বনিত হলো। মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনভোগের এই বাসনা সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে চিত্তকে সমুন্নত করে। এই ভোগবাদ দেবতার মন্দিরে করজোড়ে কাম্যবস্তুর প্রার্থনা নয়, বিপরীতের দস্যুর জিঘাংসা থেকে জীবনে শেষ নির্যাস ছিনিয়ে নেওয়া। প্রাণকে বাজি রাখতে তার তাই ভয় নেই।

আলাউদ্দিন চরিত্রের উদারতা, মহত্ত্ব ও মানবতাবোধ কবি ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যের শেষভাগে 'খিল খণ্ড' সংযোজন করে। দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধ করে রত্নসেন দেবপালকে নিহত করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। আলাওল নাগমতিকে মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। পুত্রদের বয়স যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বছর পূর্ণ হলে বিষক্রিয়ার রত্নসেনের মৃত্যু ঘটে। মৃত রাজার চিতায় পদ্মাবতী ও নাগমতি সতী হন। বাদলের মারফত রত্নসেনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিন গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি রত্নসেনের পুত্রদ্বয়কে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তুষ্ট করেন এবং চান্দেরী ও মারোয়া রাজ্য দান করেন। বাদলকেও তিনি দোহান রাজ্য দান করেন। হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীকে আদর্শ করেই আলাওল তাঁর আনুবাদ কাব্যের পরিসমাপ্তি দান করেছিলেন। এই আদর্শবাদের সঙ্গে একটা মানবিক সত্যও প্রতিষ্ঠিত হল।

পদ্মাবতীর রূপজমোহে মুগ্ধ রত্নসেন শুকের মুখে পদ্মাবতীর রূপলাবণ্য শুনতে শুনতে বারবার মূর্ছিত হন। অনুভূতিশীল মানবহৃদয়ের ভোগবাসনা সুতীব্র হলে এরূপ হওয়ায় স্বাভাবিক। ক্ষমতাবান সামন্ত নৃপতি রত্নসেনের প্রেমিকহৃদয়ে ও দেহে এই ভাবের উদয়, রাজবধূর বেদনার চিত্র একান্ত মানবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। পুত্রের যোগীত্ব বরণের দুর্ভাগ্য ও পথের দুর্বিপাকের কথা স্মরণ করে মা ব্যথিত হন। মায়ের উক্তি:

> হেন সুকোমল তনু পদব্রজগমে।
> কেমতে হাটিবা পুত্র মহাকষ্টশ্রমে।।
> তোমা বিনু রাজ্যপাট সব অন্ধকার।
> বৃদ্ধকালে আমারে না দিও দুঃখ ভার।।[১]

পুত্র রত্নসেনের প্রতি বৃদ্ধমাতার এই উক্তি সর্বকালের সকল মায়ের অন্তরাকুতির নিদর্শন। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরা নাগমতির আবেদনেও চিরন্তন নারীত্বের আর্তি ও আকুতি ফুটে উঠেছে। নাগমতির এই আবেদনও একান্ত মানবিক। কবি লিখেছেন:

তোমার বিচ্ছেদে মোর না রহিব প্রাণ।
নিজ হস্তে মারি মোরে দেও জীব দান।।
কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া যাম দাসী।
পতি যোগী নারী অনুচিত গৃহবাসী।।
তোমা সঙ্গে সুখ দুঃখ দুই প্রাপ্তি মোর।
পরিচর্যা করিমু সেবিমু পদ তোর।।[২]

পদ্মাবতী কাব্যের মানবরস সমৃদ্ধ প্রচুর তথ্য ও চিত্র অংকিত হয়েছে। পদ্মাবতীর পূজার ছলে মন্দিরে গিয়ে রত্নসেনকে সুকৌশলে দর্শন করে ফিরে আসা, মূর্ছিত রত্নসেনের দেহে সবার অলক্ষ্যে চন্দন দিয়ে প্রেমপত্র লেখা, গড়ে সিঁধ কাটার অপরাধে রত্নসেনের প্রতি শূল-দণ্ডাদেশ, শুক ও ভাট কর্তৃক রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহের ঘটকালি, রত্নসেনের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য অভিভাবকের কাছে অশ্বক্রীড়া ও শাস্ত্রালোচনা, বিবাহের পূর্বাপর সকল আয়োজনের বর্ণনা বাঙালি-হিন্দু সমাজনির্ভর ও মানবিক হয়েছে। শঙ্কাতুরা শ্বশুড়-শাশুড়ি জামাই-কন্যাকে সজল নয়নে আশীর্বাদ ও উপদেশ দিয়ে বিদায়কালে যে দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, তা আবহমানকালের বাঙালি সমাজজীবনের লৌকিক ও মানবিক চিত্র হিসেবে বিবেচ্য। বিদায়কালে পদ্মাবতী সজল নয়নে রাজমাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

মনে দুঃখ পাইলে মুঞি কাহারে কহিব।
মাও বলি হতভাগী কাহারে ডাকিব।।
শাশুড়ি ননদীজাল দুর্জন সতিনী।
তার মধ্যে নির্বান্ধবী মুঞি একাকিনী।।[৩]

রাজমাতা:

কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজমহাদেবী।
গলাগলি করি কান্দে মনে শোক ভাবি।।
বিস্তর কান্দিয়া দেবী বলে সকরুণে।
কন্যা গৃহে অবতার দুঃখের কারণে।।[৪]

সিংহলরাজের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়:

সকল প্রকারে তারে পালন করিও।
আমা সব প্রতি নৃপ দয়া না ছাড়িও।।
আর দেখা নাই এই মনে অতি দুঃখ।
কোন মতে পাসরিব হেন চান্দমুখ।।[৫]

কন্যা-জামাইয়ের প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর এই আশীর্বাদ-উপদেশ-অনুরোধ কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা কালের জন্য নয়, তা যেমন সর্বজনীন ও সর্বকালীন তেমনি সামাজিক-লৌকিক ও মানবিক।

মানবজীবনকে নিখুঁত ও গভীরভাবে উপভোগের চিত্র কবি অংকন করেছেন পদ্মাবতী কাব্যে। এই চিত্রগুলো যেমন বাস্তব ও মানবরস সমৃদ্ধ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, আলাওল তাঁর কাব্যে প্রেম-যুদ্ধ, রতি-যুদ্ধ বা কাম-যুদ্ধের চিত্র অংকন করেছেন। এই যুদ্ধের সৈনিক রত্নসেন নিজেই। এই যুদ্ধের সেনাপতি কামদেব। যুদ্ধের বাঞ্ছিত ফল নারী-বিজয় তথা পদ্মাবতী লাভ। প্রেমিকার রূপদর্শন

মাত্র প্রেমিক একেবারে কামদেবের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে ধরাশায়ী হয়। তার বিষয় চেতনা লুপ্ত হয়। রাজ্য থাকে পড়ে, ঘনঘন মূর্ছা যায় নায়ক। ধন, মান, জীবন ও যৌবন তখন সকলই নিরর্থক মনে হয়। এসবের মধ্য দিয়ে আলাওল প্রমানও করতে চেয়েছিলেন যে পদ্মাবতীর প্রতি রত্নসেনের প্রেম একেবারে নিখুঁত ও খাঁটি।

বাংলা রোমান্স কাব্যের কবি আলাওল বুঝেছিলেন, প্রেমতত্ত্বকে কেবল জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীকে আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনায় রূপায়ন করলে চলবে না। তার থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে দেহজ কামনা-বাসনাভিত্তিক প্রেমকে। কারণ তিনি জানতেন সব প্রেমের মূলেই রয়েছে দেহজ কামনা। সামন্ত দরবারের পরকীয়া প্রেমের প্রকৃতিও তাই। আর তাই কবি এই কাব্যে প্রেমযুদ্ধ, রতিযুদ্ধ বা কামযুদ্ধের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যের 'রূপবর্ণনা', 'বারমাসী', 'বাসরঘর', আরও অনেক জায়গায়। যার ফলে এই কাব্যের মানবিক আবেদন অত্যন্ত বেশি ফুটে উঠেছে।

'পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁটখণ্ড'-এ বিপরীত রতি বর্ণনা করে কবি নায়ক-নায়িকার জীবনের দাবিকে সর্বাংশে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এইসব বর্ণনায় পাঠকের রুচি পীড়িত হয় ঠিকই, তবে জীবনের চরম সত্যটা ধরা পড়ে। দেহমিলনে মানবিক প্রেমের পূর্ণ পরিতৃপ্তি, আলাওল এখানে সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন। দরবারি প্রেম, সম্ভোগে পূর্ণতা ও সার্থকতা আনয়নের জন্য কবি বিপরীত রতি বর্ণনার চিত্র অংকন করেছেন। কবি লিখেছেন:

বিপরীত রমণ সহজে মহারস।
রতিরসে কৈল সতী পতি অতি বশ।।
মখুচন্দ্র হেরি পয়োধরে দিয়া হাত।
রসোদধি ডুবিয়া স্তব্ধিত প্রাণনাথ।।[৬]

এই অংশে যৌনত্ব রুচিপীড়নের কারণ হলেও পদ্মাবতী কাব্যের মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিকতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ পদ্মাবতী কাব্যের আর একটা অধ্যায় হল 'নখশিখ খণ্ড বা পদ্মাবতী রূপবর্ণন খন্ড'। নায়িকা পদ্মাবতীর দেহ বর্ণনায় অপরূপ রূপ-ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলতে আলাওল বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগ করেছেন। তিনি পদ্মাবতীর মাথার চুল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে পায়ের নখ পর্যন্ত এসে এই রূপবর্ণনা শেষ করেছেন।

মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ পদ্মাবতী কাব্যের আর দুটো খণ্ড: 'ষট্ ঋতু বর্ণন খন্ড' ও 'নাগমতি বিয়োগ খণ্ড'। প্রথমটাতে নরনারীর দাম্পত্যজীবনে সুখ-শান্তি-সম্ভোগের, আর দ্বিতীয়টাতে পতিবিরহক্লিষ্টা নারীর হৃদয়-বেদনার আর্তির চিত্র পাওয়া যায়। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে নরনারীর হৃদয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত কামনা-বাসনা সংবলিত শাশ্বতকালের এক অনবদ্য চিত্র অংকিত হয়েছে আলোচ্য দুটো অংশে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুসরণ করে আলাওল নাগমতীর বারোমাস্যার বর্ণনা করেছেন। ষট্ ঋতুতে প্রকৃতির যে লীলা বৈচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বঙ্গ-নিঃসর্গকেই প্রতিফলিত করেছে।

বঙ্গীয় সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আলাওলের কাব্য। এছাড়াও বাঙালির চিরন্তন পারিবারিক জীবন পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে এই কাব্যে। আশঙ্কা, বিষাদ, দুশ্চিন্তা, বিচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই আলাওল বঙ্গীয় অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন। এককথায় অবিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় সংস্কৃতির

মধ্যে বাস করে তিনি কোরাণ ও পুরাণকে এক করে নিয়েছেন। আর এই উদার সমাজদৃষ্টি তাঁকে দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার বাণী ক্ষমতা।

শেখ আলাওলের পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির এক অমূল্য রত্ন। এই কব্যে তিনি প্রেম, নৈতিকতা, আত্মত্যাগ, সতীত্ব এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়গুলো অত্যন্ত সুস্পটুভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা বাংলা কাব্যধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর কবিত্বশক্তি এবং সমাজচিন্তার গভীরতা তাকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। পদ্মাবতী কাব্যের মাধ্যমে আালাওল কেবল একটি সাহিত্যকে সৃষ্টি করেননি, তিনি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতকে আলোকিত করেছে।

কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা জায়গায় নানাভাবে কবি মানবিক রস সৃষ্টি করেছেন। মধ্যযুগের কাব্য-গগনে তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন নতুন এক বিপ্লববাদের। ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, সমন্বয়-সঞ্জাত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে কবি হিন্দু-মুসলমান সমাজের মিলন স্বপ্ন দেখেছিলেন। মধ্যযুগের ধর্মীয় ভাব ও ভাবনার সর্বাত্মক প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন নরনারীর হৃদয়গত কামনা-বাসনার সফলতা-ব্যর্থতার মানবতাবাদী প্রেমকাহিনি। কিন্তু মধ্যযুগকে তিনি ছেড়ে আসতে চাইলেও, মধ্যযুগ তাঁকে পুরোপুরি ছাড়েনি— সেকথাও স্মর্তব্য।

সূত্রনির্দেশ:

(১) দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা., *পদ্মাবতী*, খণ্ড ১, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৮৮।
(২) তদেব, পৃ. ৮৯।
(৩) তদেব, পৃ. ২২৮
(৪) তদেব, পৃ. ২২৯।
(৫) তদেব, পৃ. ২৩১।
(৬) তদেব, পৃ. ১৯৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

(১) অমৃতলাল বালা, *পদ্মাবতী সমীক্ষা*, ৩য় সং., ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮।
(২) ওয়াকিল আহমেদ, *মহাকবি আলাওল: জীবন ও কাব্য*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০১০।
(৩) মমতাজউদদীন আহমদ, *মহাকবি আলাওলের পদ্মাবতী*, ঢাকা: মনন প্রকাশ, ২০০৫।